ড. এ কে এনামুল হক

কভিডকালে উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের পশ্চাৎপদতা

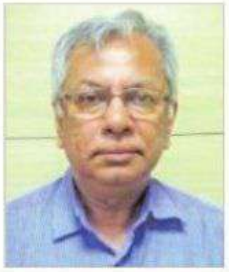

কভিড নিয়ে পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে নেই। একটা করা যায় তো অন্যটা আটকে থাকে। অর্থনীতিতে ভারসাম্য বিশ্লেষণ দুধরনের। একটি হলো আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি আর অন্যটি হলো সার্বিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ মানে হলো আপনি শুধুই আপনার নিজের বিষয়ে বিশ্লেষণ করবেন আর ধরে নেবেন বাকিরা যে যেভাবে ছিল তাই থাকবে। অর্থাৎ ধরে নেবেন বাকিরা গোল্লায় যাক। বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি কিন্তু খারাপ নয় যদি বাকিরা তাদের আচরণের কোনো পরিবর্তন না করে। ধরুন লকডাউনের কথা। লকডাউন করার বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি ছিল আংশিক। কেন? কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ধরে নিয়েছে যে হুকুম যা দেবে তা তামিল হবে। তারা বলেছে অতএব লোকজন ঘরে থাকবে। ঈদে বাড়ি যাবে না। বাস বন্ধ থাকলেই তাই কেল্লাফতে। অতএব তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সবাই ঢাকায়ই রয়ে যাবে। তা হয়েছে কি? হয়নি। কারণ মানুষ তাদের আচরণ বদলে ফেলেছে। এখানেই আংশিক বিশ্লেষণটি ব্যর্থ হলো। বাস নেই তো কী? আমি রিকশায় যাব, মোটরসাইকেলে যাব, সিএনজি অটোরিকশায় যাব। আরো কত-কী রয়েছে। ফলে সব ব্যবস্থাই ভেস্তে গেল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রীতিমতো বেকুব বনে গেল। কী কারণে তা হলো? কারণ ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিন্তাভাবনা এককেন্দ্রিক। কেবলই ভাবছে জেলে পুরে সব করা যাবে। আর করা না গেলে অন্তত বলতে পারবে যে আমার চেষ্টা আমি করেছি। দায় আমার নয়। আমি দুর্গবিত। ভাবছে না দায় গোটা সরকারের ওপর পড়বে। এভাবে দায়সারা গোছের দায় নেয়ার চেয়ে না নেয়াই ভালো ছিল। তারা জেনেশুনে কেবল দায় এড়ানোর জন্য একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থতা তাদের চেষ্টায় নয়, ব্যর্থতা তাদের বিবেচনায়। মানুষের আচরণের সার্বিক দিক বিবেচনা না করে কভিডকে অন্তরীণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভাবা উচিত ছিল যে ছেলেটি ঢাকায় একটি মাত্র কক্ষে দুই কিংবা তিনজনের সঙ্গে চাকরির জন্য বসবাস করে সে কোনোভাবেই ঈদে ঢাকায় থাকতে পারবে না। বাড়িতে তার জন্য অনেকে পথ চেয়ে বসে আছে। কেউ কথা জমাচ্ছে বোতলের ভেতর, কেউ ঘুমাতে পারছে না ছেলেকে না দেখে। এমনকি সেই যে মহেশ, সেও অপেক্ষায় আছে। তাই শেষ পর্যন্ত কী হলো? তাদের কষ্টে অর্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করে তারা কোনো রকমে বাড়ি গেল। সার্বিক বিশ্লেষণের অভাবই আমাদের ব্যর্থ করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, উপান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের কভিড আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে ঢাকা ও সংলগ্ন জেলা, সিলেট, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ, চট্টগ্রামই মূলত প্রধান। এখানেই রোগী ও শনাক্তের সংখ্যা বেশি। অথচ আমরা বোকার মতো সারা দেশকে আটকে রেখেছি সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তাতে কী হয়েছে? সবাই হাসাহাস করছে। সরকারের সত্যিকার প্রচেষ্টাকে কৌতুক করছে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিকে বলা হয়েছিল উচ্চশিক্ষায় স্থবির কার্যক্রম কী করে চালু করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে মন্ত্রী মহোদয়কে দিকনির্দেশনা দিতে। আমার ধারণা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অচলাবস্থা কাটানোর জন্যই কমিটি গঠিত। গত ১ এপ্রিলে গঠিত এ কমিটিতে ছিলেন দেশের সরকারি কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রতিনিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। তাদের গঠিত এ কমিটি এক মাস ২৩ দিন 'গবেষণা' করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে পাঠিয়েছেন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। কিছুটা আক্কেল গুড়ুম। কারণ ২০২০ সাল থেকে আমরা অনেকেই অনলাইনে ক্লাস চালিয়ে এসেছি। আমরা নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকে একটি পর্যায়ে এনেছি। কিন্তু প্রতিবেদনে তার লেশমাত্র প্রতিফলন নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে ডাকাও হয়নি। অথচ বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছে এক বছর ধরে। একমাত্র আইবিএ ছাড়া অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস নিয়মিত চালু রাখেনি, পরীক্ষাও নেয়নি। এমন একটি কমিটিতে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাউকে ডাকা হয়নি। তাতে আমি বিস্মিত ও দুঃখিত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনলাইন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোচনা ছাড়াই বিদেশী কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা ঘেঁটে তারা একটি নীতিমালা তৈরি করেছেন। কথায় বলা হয় নকলে আমাদের জুড়ি নেই। এখানেও প্রবণতা একই। উচ্চশিক্ষার একটি কমিটি যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অনলাইন শিক্ষা, সেখানে তাদের আলোচনায় দেশের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল না হয়ে একটি 'উচ্চক্ষমতা'র প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত ঔপনিবেশিক মানসিকতা প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে পাশ্চাত্যের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই নাকি তারা সুপারিশ তৈরি করেছেন।

কভিড সময়ে অনেকগুলো অনলাইন সেমিনারে আমি অংশগ্রহণ করেছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি কী করে কী করা যায়। অনেক অভিজ্ঞতার কথা জেনেছি। বুঝেছি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ভিন্ন। তাই প্রয়োজন চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া। কেবল বাংলাদেশ নয়, খোদ মার্কিন মুলুকের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিপদে পড়েছে কারণ তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ ছাত্র সঠিক ইন্টারনেট গতি পায় না। এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস বলে একটি কোম্পানি রয়েছে, যারা পৃথিবীতে 'পরীক্ষা বিক্রি' করে। অন্যভাবে বলা যায় তারা জিআরই ও টোফেল পরীক্ষা চালায়। তারা তাদের তথাকথিত পরীক্ষার 'মান' বজায় রাখতে গিয়ে প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। বলেছে পরীক্ষা চলাকালে ভিডিও অন রাখতে হবে এবং একটি প্রক্টরিং সফটওয়্যার চালু রাখতে হবে। তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। যাদের নেট স্পিড ভালো নেই, সেই সব পরীক্ষার্থী বোকা হয়ে গেছে। নেটের গতি নিয়ে ছাত্রদের কিছু করার নেই। অথচ এজন্যই তার উচ্চতর শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ। ইটিএস গা করেনি। কারণ তাদের মতে পরীক্ষার 'মান' বজায় রাখাই মুখ্য। যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে পেল, ইটিএস তাদের পরীক্ষার তথাকথিত 'মান' বজায় রাখতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং এর ফলে তারা মানসম্মত ছাত্রের বদলে ধনসম্মত ছাত্র পাবে। তাই অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন বলেছে জিআরই পরীক্ষা ছাড়াই তারা ছাত্র ভর্তি করবে। বুঝতেই পারছেন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মান আর পরীক্ষার মানকে পৃথকভাবে দেখে। আমাদের ঠিক উল্টোটা। আমরা শিক্ষার মানকে পরীক্ষার মানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। আমরা এখনো ভালো করে পড়ানোর চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চোর সাব্যস্ত করতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে রাজি। ছাত্র-শিক্ষকদের এই চোর-পুলিশ খেলার অবসান প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি মেডিকেল স্কুল পরীক্ষায় ছাত্রদের সততা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রক্টরিং সফটওয়্যার ছাত্রদের অজান্তে চালু করেছিল। পরীক্ষায় দেখা গেল, বেশকিছু ছাত্র পরীক্ষায় অসাধু পন্থা অবলম্বন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই ছাত্রদের যখন জিজ্ঞেস করল কেন তারা অসাধু পন্থা গ্রহণ করেছে এবং এজন্য তাদের পরীক্ষা বাতিল করে দেবে, তখন সুচতুর আইনজীবীর মাধ্যমে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বলে আইনি নোটিস দিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের প্রতি অসাধু আচরণ করেছে বিষয়টি আগে না জানিয়ে। তাদের অজান্তে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে, যা গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয় কী করেছে তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশেও একবার বুয়েটের এক ছাত্রকে শৌচাগারে নকলসহ ধরে ফেলেছিলেন এক পরীক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শাস্তিও দিয়েছিল। তখন আমাদের দেশেরই এক প্রখিতযশা আইনজীবী আদালতে জানালেন পরীক্ষার হল বলতে শৌচাগারকে বোঝায় কিনা? পরিশেষে ছাত্রটির শাস্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

একটি সেমিনারে ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন। সেখানে দেখা গেল ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতাকে সবাই মূল্য দিচ্ছে। বাড়িতে বসে কী করে মূল্যায়ন করা যায় তার আলোচনায় অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা জানতে চাচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহারিক অংশটি। যখন সবাই জানতে চাইলেন কী করে তা গ্রহণ করেন? তারা বললেন, তারা তৈরি করেছেন ভার্চুয়াল ল্যাব। ছাত্ররা অনলাইনে তাদের কম্পিউটারে ঢুকে ল্যাবের কাজ শুরু করেন। তাদের দেয়া সংকেত পর্যালোচনা করে তারা নিজেরাই ল্যাব সম্পন্ন করতে পারেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সহায়তা চাইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতে রাজি হলেন।

ভারতের অভিজ্ঞতাও চমকপ্রদ। ভারত সরকার প্রায় ১০ বছর আগেই সারা দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করেছিল। তার আওতায় তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব বিজ্ঞান পাঠক্রমকে ইন্টারনেটভিত্তিক ল্যাবে রূপান্তরের কাজ করছিল। তখনো কভিড আসেনি। তাদের ধারণা ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভালো শিক্ষক ও ল্যাবের অভাব হবে। সবাই যেন সমান মানের জ্ঞানার্জন করতে পারে, তাই তাদের প্রয়োজন ছিল ভার্চুয়াল ল্যাব। ২০১৫ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তা আমাকে দেখায়। একটি উদাহরণ দিই। বিজ্ঞানের বইতে ছিল সূর্যের আলো ছাড়া গাছ বাঁচতে পারে না। তারা একটি ভার্চুয়াল ল্যাব তৈরি করেছে, যেখানে ছাত্র একটি ফুলপাছের টব বিভিন্ন জায়গায় রেখে গাছের বেড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ব্যবহারিক ক্লাসে ছাত্র একটি টবকে বিভিন্ন স্থানে রেখে তার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তা ব্যবহারিক খাতায় লিখে রাখবে। এখানে মিনিটকে দিন হিসেবে দেখানো আছে। ছাত্রটি গাছকে যদি ছায়ায় রাখে তবে দেখবে কয়েকদিন পর গাছের পাতা নুইয়ে পড়বে। আর সে যদি তা জানালার পাশে রাখে তাহলে দেখবে কী করে গাছ প্রতিদিন তার পাতার মুখ জানালার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে আর তরতর করে বেড়ে উঠছে। আপনার কি মনে হয় না যে এ পর্যবেক্ষণ থেকে ছাত্রটি বিষয়টি শিখতে পারবে? তেমনি তারা টবে মাটির তারতম্য করে দেখতে পাবে গাছের বৃদ্ধির কী পরিবর্তন হয়? মঙ্গল গ্রহে না গিয়েই যদি সেখানে হেলিকপ্টার পর্যন্ত উড়ানো যায় তখন সবকিছুই কেন বাস্তব পরীক্ষাগারে করতে হবে? তা-ও একবিংশ শতাব্দীতে? পৃথিবী বিংশ শতাব্দীতে বসে নেই। এসবের কোনো প্রতিফলন নেই এ উচ্চপর্যায়ের প্রতিবেদনে। সবাই যেন অক্সফোর্ডকে নকল করতে বাংলাদেশের চাকরি করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় আগামী হেমন্তকাল থেকে ক্লাস শুরু করবে বলে ভাবছে। কীভাবে করছে জানলে উপকৃত হবেন অনেকে। প্রথমত তারা সব ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীকে টিকা দিয়েছে। বলেছে টিকা ছাড়া কেউ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবে না। তারপর বলছে, প্রতি সপ্তাহে সবাইকে কভিড টেস্ট করতে হবে। সেই ব্যবস্থাও তারা ক্যাম্পাসে তৈরি করেছে, যেন একজনের অসতর্কতার জন্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত না হয়। ভুলে গেলে চলবে না, জটলার অপর নাম শিক্ষাঙ্গন। ছাত্রদের পৃথক করে রাখা প্রায় অসম্ভব। জনসমাগম যেমন কভিড সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু, তেমনি শিক্ষাঙ্গন কী করে জটলামুক্ত থাকবে তা ভাবতে হবে? তারা প্রতি সপ্তাহে সবার কভিড পরীক্ষা দিয়েই অনাক্রান্তদের রক্ষা করবে। ভেবে দেখুন, ছাত্রাবাসে বড় আকারে কভিড সংক্রমণ হলে আমাদের ছাত্ররা কি আন্দোলন না করে বসে থাকবে?

উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো ভেবে পাচ্ছে না কী করে অনলাইনে পরীক্ষা নিতে হয়? শুধু তা-ই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছিল যে পরীক্ষা না নিয়ে কেবল পড়িয়ে যেতে! একপর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনলাইন কার্যক্রমে স্থগিতাদেশও দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত শিক্ষামন্ত্রীর চাপে সেখান থেকে তারা সরে এসেছিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটকে লক্ষ করুন। দেখতে পাবেন কী করে তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে? উচ্চক্ষমতার এ কমিটি এসব কিছু না দেখে, বিচার না করে, বিদেশে চলে গিয়েছে। জানতে চেয়েছে ইউকে, অস্ট্রেলিয়ায় তারা কী করছে? যেন এখনো আমরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করছি! তাদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কাছে আমাদের পদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক। আমরা এখনো তাদের ফেলে দেয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অনুসরণ করছি। তাদের সেই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটি পৃথিবীতে কেবল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে চালু রয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও তা চালু নেই। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই যে আইবিএর চেয়ে গুণে-মানে বড় নয় তা বলা বাহুল্য। দেশে উত্তর থাকা সত্ত্বেও কেন বিশেষজ্ঞ কমিটি অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইল্যান্ডে খোঁজ নিতে গেল তা বোধগম্য নয়। দেশের কপাল ভালো যে বিশ্ব এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। নচেৎ দেখা যেত 'বিশেষজ্ঞ দল' বিদেশ সফরে বের হয়ে গিয়েছে 'জ্ঞান' লাভের জন্য!

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দুরবস্থার সঙ্গে আমি একমত। অনেকেরই চাকরির বয়সসীমা পার হতে চলছে। তাদের অস্থিরতাও সবার বোধগম্য। কিন্তু কেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরীক্ষা নিতে পারছে না সেই প্রশ্ন কেউ করছে না। অনলাইনের সঙ্গে অফলাইন পদ্ধতিও রয়েছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অফলাইন বলতে আমি বলছি না যে ক্লাসে পড়ানো। দেশের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি অনেক বেসরকারি স্কুল অফলাইনে পড়াচ্ছে। আমরা তা দেখিনি। কিংবা প্রশ্ন করিনি কী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ তাদের পরীক্ষা নিতে পারে? দোষ কভিডের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। তারা এখনো উপনিবেশকালীন পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি লালন করে আসছে। শত বছরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি, যা আইবিএ ষাটের দশকেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাকিরা তা করতে কেন পারছে না? তা নিয়ে কোনো ভাবনার প্রতিফলন প্রতিবেদনে দেখতে পেলাম না। দায়সারা গোছের এ প্রতিবেদন দায় এড়ানোর জন্যই কি তৈরি করা হয়েছে? এমনভাবে তা লেখা হয়েছে যাতে চাপে পড়েন প্রধানমন্ত্রী কিংবা শিক্ষামন্ত্রী। অথচ তারা পরীক্ষার নিয়ম বদলাবেন না বলে ঠিক করে রেখেছেন, যা কিনা সারা বিশ্ব পরিবর্তন করে ফেলেছে।

বলছিলাম আংশিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে না দেখে পরীক্ষাকে আলাদা করে দেখছি। ধরুন, আপনি ওষুধ খেলেন, রোগ ভালো হলো। কিন্তু ওষুধের প্রভাবে যদি শরীরের অন্য কোনো শক্তির ক্ষয় হয় তখন? অর্থনীতিবিদরা তাই কেবল প্রান্তিক আলোচনায়ই আংশিক বিশ্লেষণ করেন। অন্য সব ক্ষেত্রে তারা সার্বিক বিশ্লেষণ করতে বলেন। তা না হলে একটি ঠিক করতে গিয়ে অন্যটির বিপর্যয় ঘটবে। ভারতে কভিড রোগী ভালো করতে গিয়ে ওষুধের প্রভাবে মানবদেহের এমন এক শক্তির ক্ষয় হয়েছে যে কালো ফাঙ্গাসে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছে। মানবদেহে কালো ফাঙ্গাস প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আরো অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে।

তবে দীর্ঘদিন কভিড মহামারী থাকাতে মানুষের মাঝে হতাশাবোধ বাড়ছে। চারতলা ভবনের মালিক যখন খেতে না পেয়ে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে খাবার চেয়ে পাঠালেন তখন মুখস্থ পাস কর্মকর্তা তাকে জরিমানা করলেন। বুঝতে পারলেন না, চারতলা ভবনকে টুকরো করে খাবার কেন সম্ভব না। এটুকু জ্ঞান আমরা রাখিনি। তেমনি স্বাস্থ্য বিভাগ চাইছে কভিড সংক্রমণ বন্ধ করতে। কিন্তু যখন দেখতে পেল যে দলে দলে মানুষ বাড়ি যাচ্ছে তখন কী করা উচিত ছিল? বিজিবি পাঠানো? তারা ভাবতে পারেনি যে বিজিবিও মানুষ। তাই শেষ পর্যন্ত বিজিবি অমানবিক হয়নি। বাস-ট্রেন চালু করলে অবস্থা কি খারাপ হতো? না ভালো হতো?

আমরা সবাই জানি, কভিডের টিকা প্রয়োজন। অর্থনীতির সাধারণ জ্ঞান বলে, ওষুধ-প্রতিষ্ঠানগুলো এমন টিকা কখনই আবিষ্কার করতে চাইবে না যা জীবনে একবারই দিতে হবে। প্রতি বছর না হলেও কয়েক বছর অন্তর তা দিতেই হবে। তাতে তাদের ব্যবসা টেকসই হবে। তাই দেশেই টিকা উৎপাদন জরুরি ছিল। সরকারকে ধন্যবাদ তা তারা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভেবে দেখুন শতভাগ লোককে এ টিকা বিনা পয়সায় দেয়া কখনই সম্ভব হবে না। দেশের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে যাবে। তাই ভাবতে হবে কী করে নামমাত্র মূল্যে এ টিকা বাজারে আনা যায়। সেই সঙ্গে বিকল্প চিন্তা করাও জরুরি। টিকার একটি বিকল্প হলো মাস্ক বা মুখোশ। সবাইকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে। এবং তা করতে হবে দেশের স্বার্থেই। সরকার এরই মধ্যে ১৮ দফা নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনাটি সবাই মানবে না। আড়ালে না মানলেও প্রকাশ্যে মানানোর নীতি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। যারা মানবে না তাদের কি জেলে পুরবেন? নিশ্চয় না। তাদের কি জরিমানা করবেন? তা-ও হবে না। কারণ সেই চারতলা ভবনের মালিকের কথা মনে করুন। বিস্তর হবেন। তাই নিয়ম তৈরির আগে ভাবতে হয় নিয়ম কি মানানো যাবে? না মানাতে পারলে সেই নিয়ম না থাকাই ভালো। আমাদের একটি মানসিকতা রয়েছে যেখানে আমরা নিয়মকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি না। বলি 'এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ'। কেন, শাস্তিটা কী তা বলা যায় না?

কেউ কেউ হাস্যকর যুক্তিতে মাস্ক না পরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে এক স্থানে বসিয়ে রাখুন জেলে পুরার প্রয়োজন নেই। তার যে সময় বসে থেকে নষ্ট হবে তা-ই হবে জরিমানা। নেপালের পুলিশ একবার এক নিয়ম চালু করেছিল। যারাই জেব্রা ক্রসিং ছাড়া রাস্তা পার হচ্ছিল তাদের পুলিশ বুথের একটি কক্ষে বসিয়ে সিনেমা দেখাত। আধ ঘণ্টার সিনেমায় তারা দেখাত অসতর্কভাবে জেব্রা ক্রসিং ছাড়া রাস্তা পার হতে গিয়ে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে। অঙ্গ হারিয়েছে। কভিডে মাস্ক পরা নিয়ে প্রচুর ভিডিও আছে। বসিয়ে রেখে তাকে তা দেখতে দিন। আমাদের বুঝতে হবে শাস্তির ফলে অপরাধীর অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায় না। শাস্তির সঙ্গে প্রশিক্ষণ যুক্ত হলেই তার অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়।

আমাদের প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এখন প্রয়োজন সেই একমুঠ গুড় ও এক চিমটি লবণের অসামান্য বিজ্ঞাপনটির মতো একটি বিজ্ঞাপন। ওই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেরামুক্ত হয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না যে কলেরার মূল কারণ ছিল যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ। তাতে খাবার পানি দূষিত করে। মানুষের ডায়রিয়া হয়। তবে মৃত্যু হয় কিন্তু অন্য কারণে। ডায়রিয়ায় শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। তাতেই মৃত্যু হয়। খাবার স্যালাইন সেই মৃত্যু থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। এ অসামান্য বিজ্ঞাপনটি দেশকে কলেরামুক্ত করেছে অথচ দেখুন এখনো দেশে বহু লোক যত্রতত্রই মলমূত্র ত্যাগ করে। আমরা যদি মানুষকে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করেই কলেরামুক্ত করতে চাইতাম তবে আজও বহু লোক কলেরায় মারা যেত। সচেতনতার এ অসামান্য ক্ষমতা কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের মাথা থেকে আসেনি। এসেছিল একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার মাথা থেকে।

সবশেষে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে সরকার চাপে আছে। পরিবারের একটি শিশু বা কিশোর আক্রান্ত হলে গোটা পরিবারই যে বিপাকে পড়বে তা বলা বাহুল্য। এখন কিন্তু অনেক পরিবারেই একটি কিংবা দুটি সন্তান। তাদের এই পুত্র-কন্যাই সব। তাই সরকারকে সাবধানী হতেই হবে। শিক্ষামন্ত্রীকে তাই বাহবা দিই। তিনি অন্তত পিতা-মাতাদের মনের অবস্থা বোঝেন। তবে অনেকেই শিক্ষাঙ্গন খুলতে অধিকতর আগ্রহী। হয়তোবা তাদের কোচিং ব্যবসা বাড়বে। ভাবতে হবে, আক্রান্ত শিশুটি বিদ্যালয় থেকে আক্রান্ত হলে এবং কভিডের ফলে শিশুটির স্বাস্থ্যের মারাত্মক কোনো ক্ষতি হলে দায় কে নেবে? শিক্ষক? বিদ্যালয়? নাকি তার পিতামাতা?

অনলাইনে পড়াশোনা চালানোর পরও অনেক ছাত্র কভিডে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু তার দায় শিক্ষাঙ্গনের নয়। ভুলে গেলে চলবে না, যেকোনো সংক্রমণ রোগেই আমরা স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখি। আমার এক ছাত্র কভিডে আক্রান্ত হয়ে গত দুটি মাস অত্যন্ত কষ্টের জীবনযাপন করছে। বাড়িতে মা-বাবার কাছে থেকেও তার বর্ণনা আপনাকে দুঃখ দেবে। তার কভিড-পরবর্তী অসুস্থতা সে প্রকাশই করতে চায় না। আমাকে লিখে পাঠিয়েছে। ভালো ছাত্র ছিল কিন্তু এখন পড়তে মন বসে না। তবুও অনলাইন ক্লাসে থাকে। কিন্তু চিন্তা করতে, কিছু লিখতে পারছে না। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সে নিজেই এখন চিন্তিত। তাই সরকারকে হুজুগে না চলে হতে হবে সাবধানী, সংবেদনশীল। 'মুখস্থ শিক্ষিত' কতিপয় লোকের পরামর্শ নেয়ার আগে ভাবতে হবে, তাদের মাথায় চিন্তার লেশমাত্র নেই। তাদের প্রবণতা হলো অন্যকে নকল করা।

স্কুল খোলার আগে ভাবতে হবে কী করে ঝুঁকিবিহীনভাবে ছাত্রদের ক্লাসে আনা সম্ভব। প্রায় এক বছর আগেই আমি লিখেছিলাম, ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে স্কুল-কলেজ খোলার আগে। ক্লাসের ভেতর দূরত্ব বজায় রাখতে হলে ছাত্রসংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। জরুরি অবস্থায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আমাদের ভাবতে হবে কী করে সপ্তাহে তিনদিন অর্ধেক ছাত্রকে বিদ্যায়তনে আনা যায়, আর বাকি অর্ধেককে আনা যায় অন্য তিনদিন। তা করতে গিয়ে স্কুলের সময় বাড়াতে হবে। অর্ধেক দিনের স্কুলে তা করা যাবে না। পড়াশোনার রুটিন বদলাতে হবে। শিক্ষকদের অনলাইন/অফলাইনের পাশাপাশি স্কুলেও আসতে হবে। বিষয়টি সহজ নয়। ঢাকার অধিকাংশ স্কুলই চলে অর্ধেক দিন, বাকি অর্ধেক দিন চলে তাদের কোচিং ব্যবসা। শিশুদের টিকা দেয়ার কথা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় শিশুদের দীর্ঘ জীবনে কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রয়োজনীয় গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো দেশই শিশুদের টিকা দেবে না। তাই ভেবে দেখতে হবে পাঠক্রমের কোন কোন অংশ স্কুলে না গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? কেবল সেই অংশের জন্যই কি অর্ধেক অর্ধেক করে ছাত্রদের ক্লাসে আনা যায়? তারও একটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কোনো বিশ্লেষণ ছাড়া কেবল জুম সভায় এসব নিয়ম চালু করা জাতির সঙ্গে তামাশার শামিল। সবশেষে স্কুল-কলেজ খুলে দেয়ার আগে, যেসব স্কুল দূরত্ব ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মানতে ব্যর্থ হবে, তাদের শিক্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থাও নিয়মভুক্ত করতে হবে। আশা করি ভাববেন।

ড. এ কে এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট